ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-৮

# পৃথিবীর কথা

সম্পাদনা ও সংকলন
সমীর কান্তি নাথ
জয়দীপ দে

ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-৮
পৃথিবীর কথা
সম্পাদনা ও সংকলন : সমীর কান্তি নাথ ও জয়দীপ দে

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক ও সম্পাদকদ্বয়

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

---

Prithibir katha edited by Samir Kanti Nath & Joydip Dey Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 Second Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

**ISBN:** 978-984-95631-7-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

## উৎসর্গ

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ

**রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী**

**ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা**

১. উদ্ভিদবিজ্ঞান
২. প্রাচীন পৃথিবী
৩. মহাবিশ্ব
৪. মানবদেহ
৫. গণিত
৬. প্রাণিবিজ্ঞান
৭. মানববিজ্ঞান
৮. পৃথিবীর কথা
৯. ভৌতবিজ্ঞান
১০. মনোবিজ্ঞান

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭
পৃথিবীর জন্মকথা ৯
পৃথিবীর ভেতর-বাইর ১৫
আবহাওয়ার পূর্বাভাস ১৯
বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু ২৫
জোয়ার-ভাঁটা ৫৪
তুষারের দেশ—অ্যানটার্কটিকা ৬২
নদীর কত জল ৬৯
নদীশাসন ও বন্যানিয়ন্ত্রণ ৭৫
বাতাসের কথা ৭৮
বৃষ্টি ও বনানী ৮১
মাটি ও জীবজগৎ ৮৭
পৃথিবীকে ঘিরে প্রশ্ন ৯৩

# ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অগ্রদূত ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি বলতেন, *যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা হয় না, তারা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।*

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই পরিষদের পক্ষ থেকে সে বছরই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম সম্পাদক হিসেবে প্রকাশিত হলেও এর নেপথ্যে ছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কলকাতার আপার সার্কুলার রোডের বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি তখন দুই বাংলায় দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এখনও পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। এ পত্রিকায় বিজ্ঞানের আধুনিকতম বিষয়বস্তুগুলো রুচিশীল ভাষা ও সাবলীল বর্ণনায় উপস্থাপন করা হতো। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালি কিশোর-তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা বিনির্মাণে এই পত্রিকার ভূমিকা অনন্য। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর পুরনো সংখ্যাগুলো ঘেঁটে ধ্রুপদী কিছু বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ একত্রিত করা হয়। সেসব প্রবন্ধ সিরিজ আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

এবারের প্রবন্ধমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পৃথিবী সম্পর্কিত ১২টি প্রবন্ধ। এর আগে বলে নেয়া দরকার কেন এমন একটি কাজে হাত দেয়া। বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। মোবাইলফোন বলতে গেলে সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি এখন নতুন প্রজন্মের কাছে শিশুকাল থেকে সহজলভ্য। এর বাইরে আছে নানা ধরনের ভিডিও গেম।

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে তোলার জন্য মৌলিক বিজ্ঞানবিষয়ক পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে সহজবোধ্য মৌলিক বিজ্ঞানের বইয়ের অপ্রতুলতা রয়েছে। আবার যে বইগুলো সচরাচর পাওয়া যায় তার বর্ণনা ও উপস্থাপনা উপভোগ্য নয়। এ কারণে বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোররা সেসব বই পড়ায় আগ্রহী হয় না। কিন্তু শিশু-কিশোরদের মনের মাঝে প্রকৃতির নানা বিষয়ের প্রতি জানার সহজাত আগ্রহ রয়েছে। এ আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে সহজেই বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন করা যায়।

এ পর্বে পৃথিবী সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শিশু-কিশোররা পৃথিবীর জন্মকথা, পৃথিবীর গঠন, আবহাওয়া-জলবায়ু ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে। এর পাশাপাশি মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, জোয়ার-ভাঁটা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা কেন ঘটে, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে ঝড়ের কী নাম, কেন এত বৈচিত্র্য—তা জানতে পারে। এক কথায় পৃথিবী সর্ম্পকে জানতে আগ্রহী হয়। শিশু-কিশোরদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে প্রবন্ধগুলো সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবন্ধের শিরোনামে সামান্য পরিমার্জন আনা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুতে সাম্প্রতিক সময়ে যে পরিবর্তন এসেছে তা সংযুক্ত হয়েছে।

মূলত শিশু-কিশোরদের মৌলিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই সিরিজ বা প্রবন্ধমালা প্রকাশ। শিশু-কিশোররা এতে যদি সামান্য উপকৃত হয় তাতেই এ আয়োজন সার্থক।

# পৃথিবীর জন্মকথা

## নলিনীনাথ রায়

কারও জীবনী লেখার সময় তাঁর জন্মের তারিখ থেকে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু পৃথিবীর জীবনী লিখতে গিয়ে তার জন্মতারিখের জন্য আমরা ব্যস্ত হব না। কীভাবে তার জন্ম হলো তাই আলোচনা করব। পৃথিবীকে কেউই জন্মাতে দেখেনি। কাজেই সে সম্পর্কে যা কিছু স্থির করা হয়েছে তা অনুমাননির্ভর। আর সে অনুমান আমাদের নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। তাঁরা বলেন যে, কোটি কোটি যুগ আগে অত্যন্ত উত্তপ্ত বিশাল বাষ্পগোলকের সৃষ্টি হয়। এ গোলক যে কত বড় তা আমরা ধারণাই করতে পারি না। যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ এবং সূর্য এ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এ বাষ্প আমাদের সাধারণ আবহাওয়ার বাষ্প নয়। এ বিশ্বে যত প্রকার পদার্থ আছে এটা ছিল তাদেরই বাষ্পাবস্থা।

এই যে সুবৃহৎ গোলকের কথা বললাম তা কিন্তু স্থিরভাবে ছিল না, মহাশক্তিতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘুরছিল। এই দ্রুত ঘূর্ণনের ফলে এর শরীর থেকে মাঝে মাঝে এক-একটি প্রকাণ্ড অংশ ছিটকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মহাগোলকের চারদিকে ঘুরতে থাকে। একইসঙ্গে অংশগুলো নিজ অক্ষের ওপরও ঘুরতে থাকে। তোমরা অনেকেই হয়তো লাটিম ঘুরিয়ে থাকো। লাটিম যখন খুব জোরে ঘুরতে থাকে তখন যদি ওটার মাথার ওপর ফোঁটা ফোঁটা করে পানি ফেলা হয় তাহলে সে পানি দূরে ছিটকে পড়ে। সে রকম এই ঘূর্ণায়মান মহাগোলক থেকে বড় বড় অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল। আর সেই এক-একটি অংশকে আমরা গ্রহ নাম দিয়েছি। এভাবেই গ্রহগুলো সৃষ্টি হয়েছিল। সূর্য থেকে দূরত্বের ক্রম অনুযায়ী তাদের নাম হলো : বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। দূরত্বের হিসাবে পৃথিবীর স্থান তৃতীয়। সূর্য থেকে এদের সকলেরই উৎপত্তি হয়েছে। এ হলো পৃথিবীর জন্মের বিবরণ।

এখানে অন্যান্য গ্রহের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হলেও সামান্য কিছু বলছি। গ্রহদের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় বৃহস্পতি। এর ব্যাস ৯০ হাজার মাইল ও সূর্য থেকে ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবীর ব্যাস ৮ হাজার মাইল। সূর্য থেকে পৃথিবী প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে আছে। বুধ সূর্যের খুব কাছে এবং প্লুটো খুব দূরে অবস্থিত।

মহাগোলক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবী বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তপ্ত সাদা বাষ্পপূর্ণ গোলকের আকার ধারণ করে। এই বাষ্পপূর্ণ পদার্থ নিজের অক্ষদণ্ডের ওপর ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বেড়ায়। যত সময় যেতে লাগল উত্তপ্ত বাষ্প ক্রমশ শীতল হয়ে বাষ্প জমাট বাঁধতে লাগল। তোমরা দেখেছ যে, ফুটন্ত পানির বাষ্প ঠাণ্ডা হলে আবার পানিতে পরিণত হয়। এ সময়ে প্ল্যাটাসিলিয়াম নামের এক গ্রহাণু পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়ে। এতে শরীর থেকে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে বের হয়ে যায়। তারপর পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে। এর একটি অংশকে আমরা বলি চাঁদ। চাঁদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ।

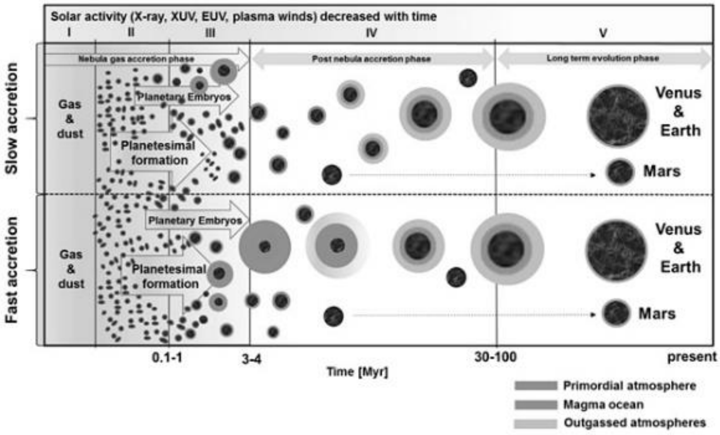


ছবি : পৃথিবী সৃষ্টির ধারণা

বহুযুগ ধরে এই উত্তপ্ত তরল পৃথিবী ক্রমশ শীতল হতে থাকে এবং তার উপরিভাগে একটি কঠিন স্তর জমতে থাকে। কিন্তু এ স্তরের নিচে তরল পদার্থ উত্তপ্ত অবস্থায় থেকে গেল। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে শীতল হবার সময় উত্তপ্ত পদার্থ সংকুচিত হয় অর্থাৎ কুঁচকে ছোট হয়ে যায়। এ সংকোচন

সবস্থানে সমান নয়; যেখানে বেশি সেখানটা উঁচু হয়ে উঠল ও যেখানে কম সেখানটা সমতল থেকে গেল। এ সংকোচনের ফলে উপরের স্তর নিচের তরল ও গলিত পদার্থের ওপর চাপ দিতে থাকে। কোনো কোনো স্থানে পুরু স্তরের ভারে অপেক্ষাকৃত পাতলা দুর্বল স্থান ভেদ করে জলীয়বাষ্প ও গলিত পদার্থসমূহ অত্যন্ত জোরে বিকট শব্দে বের হতে লাগল। এ গলিত পদার্থ উপরে এসে গহ্বরের মুখের চারদিকে জমে গেল। দেখা গেছে, এ গলিত পদার্থ পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে পৃথিবী যত শীতল হতে লাগল ততই এ রকম অগ্ন্যুৎপাত ক্রমশ বেশি পরিমাণে ঘটতে লাগল।

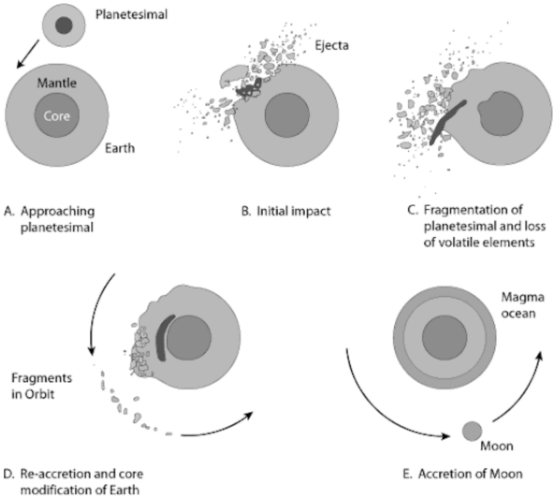


ছবি : পৃথিবী থেকে চাঁদ সৃষ্টির ধারণা

সঙ্গে সঙ্গে জল ও স্থলে নানা ধরনের পরিবর্তন চলতে লাগল। জল ও স্থলভাগ চিরস্থায়ী নয়; নিয়ত পরিবর্তনশীল। বর্তমানে যেখানে আটলান্টিক মহাসাগর রয়েছে সেখানে আটলান্টিস নামে একটি মহাদেশ ছিল। মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমি, চীনের দক্ষিণ প্রদেশ, তুরস্ক, আরব দেশের উত্তরাংশ এবং সাহারা মরুভূমি প্রাচীনকালে সমুদ্র ছিল। এভাবে জল ও স্থল পরস্পর তাদের স্থান পরিবর্তন করছে। আজ যেখানে জল রয়েছে, কে জানে কিছুকাল পরে সেখানে স্থল দেখা দিবে কিনা। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, এসব স্থলের উদ্ভব ও বিলুপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ ভূমিকম্প। আবার ভূমিকম্পের কারণ পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অস্থির অবস্থা।

ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবীর উপরের স্তরের কী রকম পরিবর্তন হয় তা আমরা দুই-এক স্থানের ভূকম্পের বিবরণ পাঠ করে জানতে পারি। প্রায় দেড়শ বছর  আগে জারুল্লোতে এক ভদ্রলোকের ৪ বর্গমাইল জুড়ে একটি খামারবাড়ি ছিল। তার দুই পাশে দুটি নদী ও অপর দিকে পাহাড়। ১৭৫৯ সালে জুন মাসে কয়েক সপ্তাহ ধরে মাটির মধ্যে অদ্ভুত রকমের শব্দ ও ভূমিকম্প হতে থাকে। পরে আবার বন্ধ হয়ে যায়। তখন কেউই আর সে বিষয়ে মনোযোগ দেয়নি। ২৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে পুনরায় ভূমিকম্প আর সেই শব্দ দ্বিগুণ জোরে আরম্ভ হয়। লোকজন ভয়ে নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। তারা দেখল, তাদের মালিকের খামারবাড়ির জমি চারপাশের জমির চেয়ে উঁচু হয়ে গেছে, আর ধারগুলো ৩৯ ফুট খাড়া হয়ে উঠছে এবং মধ্যস্থলে ৫০০ ফুট উঁচু একটি পাহাড় চূড়া সৃষ্টি হয়েছে। তার ভিতর থেকে ছাই, উত্তপ্ত পাথর বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নদী দুটি পাশের ফাটলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সেখান থেকে মেঘের আকারে জলীয়বাষ্প উঠতে লাগল। ক্রমশ সমস্ত পাহাড়টিতে ছোট ছোট অনেকগুলো চূড়া বের হলো। তাদের ভিতর থেকেও আগুন, বাষ্প, ছাই, পাথর ইত্যাদি বের হতে লাগল। এর যে চূড়াটি সবচেয়ে উঁচু হয়ে উঠেছিল তার উচ্চতা প্রায় ১৬০০ ফুট। চার মাস ধরে এই উৎপাত চলছিল এবং এর ছাই-মাটি ১৫০ মাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল।

১৮৮৩ সালে ক্রাকাতোয়া দ্বীপের আগ্নেয়গিরি থেকে দেড় মাইল ব্যাস ও ৩০০ ফুট উঁচু যে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা উঠেছিল তা ৫০ মাইল দূর থেকে দেখা গিয়েছিল। মধ্যে মধ্যে এর ভিতর থেকে বড় বড় পাথর ৩০০-৪০০ ফুট উপরে উঠে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ছিল। গলিত গন্ধক পাহাড়ের গা বেয়ে পড়ছিল। এর তাপ এত প্রচণ্ড হয়েছিল যে, দেড় মাইলের মধ্যে কেউই ঘেঁষতে পারছিল না। এ অবস্থা কয়েক মাস চলার পর আর সেদিকে জনসাধারণের মনোযোগ রইল না।

সে বছর ১২ আগস্ট তারিখে সকালে দেখা গেল যে, ক্রাকাতোয়া বন্দরে নোঙ্গর করা যত নৌকা ছিল সবগুলো একদিকে ছুটছে ও পরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এ সময় ক্রাকাতোয়া দ্বীপ থেকে সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত পানি দুই ভাগ হয়ে সরে গিয়ে তার মাঝ থেকে একটি বিশাল প্রাচীরের মতো উঁচু ও লম্বা আগুনের শিখা বের হতে লাগল, আর তারই দুই পাশে দুটি লম্বা

ছবি : ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরি

খাদ হয়ে তার মধ্যে সমুদ্রের পানি হিস হিস শব্দে সজোরে বয়ে যেতে লাগল। বন্দরের নৌকা-ডিঙি যা কিছু ছিল দ্রুতবেগে খাদের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত এনজের শহর থেকে এর শব্দ শুনে ভীত ও সন্ত্রস্ত অধিবাসীরা তা দেখতে এলো। এ সময় হঠাৎ একটি বিকট শব্দ হয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এনজের যদিও ক্রাকাতোয়া থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত, তবুও এ অগ্নুৎপাত থেকে বাঁচতে পারেনি। তার ৬০ হাজার বাসিন্দা এবং তাদের ঘরবাড়ি-বাগান প্রভৃতি যা কিছু সবই যেন কেউ মুছে ফেলল। যেখানে শহর ছিল সেখানে তখন ১০০ ফুট পানি। এর ভীষণ শব্দ ২০০০ মাইল দূর পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল ও বের হয়ে আসা ছাই হাজার হাজার মাইল দূরের দেশসমূহেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

অগ্নুৎপাতের সময় কখনো কখনো পাহাড়ের কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮২২ সালে বিসুভিয়াস থেকে ৮০০ ফুট পাহাড় উড়ে যায়। ১৮৮৬ সালে নিউজিল্যান্ডের টারাওয়েরার অগ্নুৎপাতে তার দক্ষিণ-পশ্চিমের পুরো অংশ মাটির ভিতর বসে যায় এবং ২০০০ ফুট লম্বা ৬০০ ফুট চওড়া ও ৮০০ ফুট গভীর একটি প্রকাণ্ড গহ্বর সৃষ্টি হয়। ১৮৮৮ সালে জাপানের ব্যান্ডাইসন আগ্নেয়গিরি থেকে ১,৪৮৭,০০০,০০০, কিউবিক ফুট পাথর উড়ে যায়।

পৃথিবীর জল-স্থল পরিবর্তনকারী শক্তিগুলোর মধ্যে সমুদ্রের ঢেউও কম ভয়ংকর নয়। একে সাধারণভাবে সুনামি বলা হয়। সমুদ্রতলে প্রবল ভূমিকম্পের কারণে এই ভয়ংকর ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় ও সমুদ্রতীরে এসে ৮০ থেকে ১০০ ফুট উঁচু হয়ে স্থলভাগে আছড়ে পড়ে ধ্বংস সাধন করে। ১৭৩৭

সালে যে সুনামি লোপাটকা অন্তরীপকে গ্রাস করেছিল। তা প্রায় ২০০ ফুট উঁচু ছিল ও তারই প্রভাবে জল ও স্থলের কোনো কোনো অংশ স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ১৭৯৬ সালে এ রকম ভূমিকম্পে কয়েক হাজার ফুট উঁচু ও তিন মাইল পরিধির একটি দ্বীপ সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে উঠেছিল।

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের উপকূলের সমুদ্রগর্ভে সংঘটিত ভূমিকম্পে (সুনামি) বিশ্বের ১৪টি দেশের প্রায় দুলাখ ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে। সুনামির জলোচ্ছ্বাস কোথাও কোথাও ৩০ মিটার অবধি উঁচু হয়ে বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে, বাড়িঘর ধ্বংস করে মানুষজনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ছবি : সুনামি

পৃথিবীর উপরের স্তর যথেষ্ট পরিমাণে শীতল হবার পর সর্বপ্রথম শৈবাল জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদের উৎপত্তি ঘটে। তারপর ক্রমশ অন্যান্য উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ করে। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ তখন বিশাল বৃক্ষের মতো হয়ে জন্মাত। বিশাল বৃক্ষের মতো ফার্ণ জাতীয় গাছ এখনও কোনো কোনো দ্বীপে দেখতে পাওয়া যায়। জীব সৃষ্টির প্রথমে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জলজ জীবের সৃষ্টি হয়। তারপর ক্রমশ জলচর, উভচর ও স্থলচরের সৃষ্টি হয়। সে প্রাগৈতিহাসিক যুগে সরীসৃপ জাতীয় কিছু বৃহদাকার জীবের আবির্ভাব ঘটে। পরে তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদ্ভিদরাজ্য ও জীবরাজ্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে স্তন্যপায়ী ও পক্ষিকুলের সৃষ্টি হয়। মানুষ এবং দাঁতযুক্ত ও দাঁতবিহীন পক্ষী এ সময়ে সৃষ্টি হয়। এভাবে ক্রমশ নানা ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী বর্তমান অবস্থায় এসেছে।

# পৃথিবীর ভেতর-বাইর
## শিশিরকুমার দাশ

কী বিশাল এই পৃথিবী! ১৯৭,৯৫০,২৮৫ বর্গমাইল তার আয়তন। মানুষের কাছে কত বড়! বিচিত্র বস্তুর সমন্বয়ে নিজেকে সে করে রেখেছে অশেষ বৈচিত্র্যের আধার। প্রাচীন লোকেরা ভাবতেন—এই পৃথিবীই বুঝি সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে। আর তারই চারদিকে পরিক্রমণ করছে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক। কিন্তু গ্যালিলিও আর কোপারনিকাসের সময় থেকেই পৃথিবীর সম্পর্কে লোকের এই ধারণার পরিবর্তন হতে থাকে।

ছবি : গ্যালিলিও (বাঁয়ে) আর কোপারনিকাস

পৃথিবী গোলাকার। দুটি শক্তির ক্রিয়ায় পৃথিবীর এই রকম অবস্থা ঘটেছে। একটি তার নিজের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, আর অপরটি কেন্দ্রাতিগ শক্তি। ফলে নিরক্ষরেখার কাছে কিছুটা মোটা হয়েছে পৃথিবী।

ভূপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে) আধামাইলের কিছু বেশি। সবচেয়ে বেশি উচ্চতা সাড়ে পাঁচ মাইল। সমুদ্রের গড়পড়তা গভীরতা হলো দুমাইল। সবচেয়ে বেশি গভীরতা সাড়ে ছয় মাইল। হিমালয় পর্বতের চূড়া এভারেস্টই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা। উচ্চতায় ২৯,১৪১ ফুট।

পৃথিবীর সবচেয়ে নিচু জায়গা হলো ডেড সি, সমুদ্রপৃষ্ঠের ১২৯০ ফুট নিচে। মহাদেশগুলোর গড় উচ্চতা ২০০০ ফুটের মতো। এশিয়া ৩৩০০ ফুট, ইউরোপ ১১০০ ফুট, আমেরিকা ৩১০০ ফুট, আফ্রিকা ২২০০ ফুট, অস্ট্রেলিয়া ৭০০ ফুট ও অ্যানটার্কটিকা প্রায় ৬০০০ ফুট। এই পৃথিবীকে যদি ছোট করে কল্পনা করা যায়, যেমন মনে করা গেল তার ব্যাস $\frac{১}{৪}$ মাইল, তখন তার মহাদেশগুলোর গড় উচ্চতা মনে হবে ১ ইঞ্চি। এভারেস্ট মনে হবে মাত্র দশ ইঞ্চি।

পৃথিবীর কঠিন অংশকে বলা হয়েছে লিথোস্ফিয়ার। লিথো মানে পাথর। জলভাগের নাম দেয়া হয়েছে হাইড্রোস্ফিয়ার। সব হ্রদ, নদী, সমুদ্র এবং মাটির তলার পানিও এই অংশের অন্তর্গত। আর সারা পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে আছে বায়ুস্তর। তার নাম অ্যাটমসফিয়ার। যেমন রহস্যভরা এই পৃথিবীর উপরিভাগ, আবার তেমনই তার অভ্যন্তর। তার গোপন গর্ভে কী যে সঞ্চিত আছে তা সঠিক জানা যায়নি। প্রতিনিয়ত কত বিস্ময়কর বস্তু যে জমা হচ্ছে তার অন্ধকার অভ্যন্তরে তার সন্ধান পাওয়া বড় শক্ত।

মানুষ মাটি খুঁড়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যেতে পেরেছে মাত্র দেড় মাইল। ৪০০০ মাইল যার ব্যাসার্ধ সেখানে কত তুচ্ছ এই দেড় মাইল! তাই পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে আমাদের এখনও তেমন কিছু জানা হয়নি। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরোক্ষ উপায়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের খবর জানার চেষ্টা করছেন। সেই কথাই আজ তোমাদের কিছু বলব।

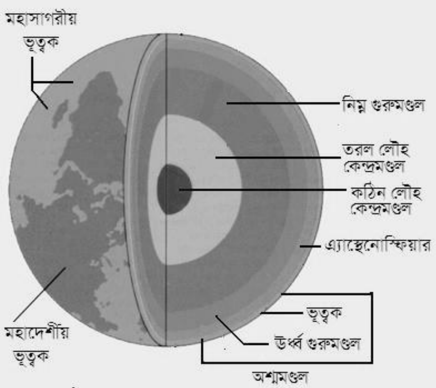


ছবি : পৃথিবীর অভ্যন্তর